শক্তি সম্বন্ধে তাঁর এতটাই জানার স্পৃহা ছিল যে, তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে ডক্টর উসুই এরপর চলে আসেন তিব্বতে। সেখানে তিব্বতি কমলসূত্রের মতো মূল্যবান প্রাচীন পাণ্ডুলিপির তিনি সন্ধান পান। সাধনার এই পদ্ধতি জানার পর তিনি ফিরে যান জাপানের সেই জেন মঠে। সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে জানান তাঁর ফললাভের কথা। সেই মঠাধ্যক্ষের কথামতো কিয়োতো শহর থেকে ষোলো কিমি দূরে ক্যুরি ইয়ামা পাহাড়ে চলে গিয়ে তিনি নির্জনে সাধনা করতে থাকেন। একুশ দিন ধরে উপবাস করে সাধনা করার পর একদিন ভোরবেলা তিনি অনুভব করলেন দূরে পুব আকাশে এক শুভ্র আলোর জ্যোতি। রামধনু রংয়ের আলোর বুদবুদ যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। তাঁর মনে হল, সেই আলোর দ্যুতি ক্রমশ এগিয়ে এসে তাঁর দুই ভ্রূ-র মধ্যে তাঁর আজ্ঞাচক্রে মিলিয়ে গেল। তিনি বিদ্যুতের মতো শিহরণ অনুভব করলেন। তখনই তাঁর ভিতর থেকে কেউ যেন বলল, আজ তোর সাধনা সম্পূর্ণ হল। এই সাধনা ও উপলব্ধি যেন মানুষের কাজে লাগে।

বেশ খানিকক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকার পর ডক্টর উসুই যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন অনুভব করলেন দীর্ঘ উপবাস ও সাধনার ধকল তাঁর দেহমন থেকে চলে গেছে। তাঁর শরীরে এখন অমিত শক্তি। খুশিতে আপ্লুত হয়ে তরতর করে পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে পাথরে লেগে তাঁর পায়ের আঙুল থেকে রক্ত বেরোতে লাগল। তিনি হাত দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরলেন। তাঁর রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল। ব্যথাও সেরে গেল। এবার তিনি পথের ধারের একটি সরাইখানায় গেলেন। একটি বাচ্চা মেয়ে ডক্টর উসুইয়ের জন্য খাবার নিয়ে এল। মেয়েটির গাল বেশ ফোলা। ডক্টর উসুই জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, মেয়েটি দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। তিনি মেয়েটির গালে স্নেহের হাত রেখে একটু পরে হাত সরিয়ে নিলেন । লক্ষ করলেন, মেয়েটির দাঁতের ব্যথা পুরোপুরি কমে গেছে। গালের ফোলাটাও আর নেই। পরপর ঘটে যাওয়া এই আশ্চর্য ঘটনাগুলি থেকে ডক্টর উসুই নিশ্চিত হলেন তিনি এক দিব্য শক্তি অর্জন করেছেন। তাঁর কাজ এই শক্তিকে মানুষের কাজে লাগানো।

রেইকির তত্ত্ব

গড়িয়ার বাসিন্দা পিনাকীরঞ্জন চৌধুরী একজন রেইকি গ্র্যান্ডমাস্টার। নামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদক পেয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছেন। কিন্তু ঐহিক জগৎ নয়, তাঁর ধ্যান জ্ঞান সাধনার জায়গা নিয়েছে রেইকি। কলকাতার একটি রেইকি সেন্টারের সঙ্গে তিনি যুক্ত। মনোবিজ্ঞানীরা যা বলেন, তাঁর কথাও সেটাই। অবচেতন মনের অবদমিত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঘৃণা ইত্যাদি আমাদের অজান্তেই চেতন মনে চলে আসে। এভাবেই আমাদের মধ্যে রোগ জন্ম নেয়। নেগেটিভ থট বা মনের প্রতিকূল ভাবনাই আমাদের সত্তর শতাংশ রোগের জন্য দায়ী।

পঞ্চতত্ত্ব দিয়ে গড়া আমাদের স্থূল শরীরের চারদিকে তিন থেকে আট ইঞ্চি ক্ষেত্রের মধ্যে আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের অবস্থান। এই সূক্ষ্ম শরীরকে বলা হয় এনার্জি বডি। এনার্জি বডি হল আমাদের স্থূল শরীরের কবচ। এই কবচ আমাদের স্থূল শরীরকে বাইরের বিকৃতি থেকে রক্ষা করে। এই এনার্জি বডির মধ্যে রয়েছে সাতটি শক্তি কেন্দ্র। একে বলে এনার্জি সেন্টার। এই শক্তি কেন্দ্র আমরা দেখতে পাই না। এই সাতটি এনার্জি সেন্টার বা চক্র নিয়ে আমাদের দেশের যোগীপুরুষরা তাঁদের নিজেস্ব শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করেছেন। এই সাত শক্তি কেন্দ্রকে শাস্ত্রীয় ভাষায় বলে ষটচক্র। এদের মধ্যে দুটি ঈশ্বরীয় চক্র। বাকি পাঁচ চক্রে আমাদের শরীরে নিহিত পাঁচটি তত্ত্বের পোষণের কাজ করে।

আমাদের স্থূল শরীর আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি ও পৃথিবী এই পাঁচটি তত্ত্ব দিয়ে গড়া। আমাদের স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীরের সাড়ে তিন ফুট পরিমাণ ক্ষেত্রের মধ্যে আর একটা শরীর থাকে। শাস্ত্রের ভাষায় তাকে মনোময় শরীর বলে। মনোময় শরীর ভাবনার উৎপাদন করে আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের মাধ্যমে স্থূল শরীরে প্রবেশ করায়। একজন সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কে একদিনে গড়ে ষাট হাজার ভাবনার উদ্রেক হয়ে থাকে। আমরা তা জানতেও পারি না। তার কারণ আমাদের মনের মধ্যে অসংখ্য ভাবনার জন্ম হয়, আবার তা আপনা আপনিই লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু মনের উপর ভাবনার অনাবশ্যক চাপ বেশি হয়ে গেলে সূক্ষ্ম শরীর তা বহন করতে পারে না। তখন যে অংশ দুর্বল হয়ে পড়ে সেখানে শুরু হয় যন্ত্রণা। পেনকিলার কিছু সময়ের জন্য আমাদের মস্তিষ্ককে ব্যথার কথা ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু ওষুধের প্রভাব শেষ হতেই আবার শুরু হয় ব্যথা। আর মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ খাবার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যে কতটা মারাত্মক তা আমরা সকলেই জানি। আমাদের তিনটি মূল শত্রু। ভাবনার অতিরিক্ত চাপ, অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়া আর দূষিত পরিবেশ। এই তিনের আক্রমণ আমাদের শরীরের পঞ্চতত্ত্বকে ভাঙচুর করে দেয়। তখন ব্যায়াম, যোগাসন, ভক্তিসাধনা করে সুস্থ থাকার চেষ্টা করি আমরা। রেইকি অনুশীলনেও শরীর-মন সুস্থ রাখা যায়। রেইকির সুবিধা হল এর অনুশীলন ও প্রয়োগ সহজ। এর কোনও ক্ষতিকর দিক নেই। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। রেইকি শক্তি প্রয়োগ করলে আমাদের সূক্ষ্ম শরীরে স্থিত চক্রগুলো গতি ও শক্তি ফিরে পায়। ফলে শরীরের পঞ্চতত্ত্ব সক্রিয় হয়। রোগাক্রান্ত মানুষটি রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়।

ভারতীয় যোগশাস্ত্র ও রেইকি

আমাদের মেরুদণ্ডের ভিতর তিনটি নাড়ির অবস্থান। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। সুষুম্না নাড়ির সবচেয়ে নিচের অংশে মূলাধার চক্র। তারপর স্বাধিষ্ঠান চক্র, মণিপুর চক্র, অনাহত চক্র, বিশুদ্ধ চক্র, আজ্ঞা চক্র এবং সবচেয়ে ওপরে মস্তিষ্কে সহস্রার চক্র বা সহস্রদল পদ্মস্থিত। সবচেয়ে নিচের চক্রতেই সমস্ত শক্তির সমাবেশ। সেই শক্তিকেই ওই জায়গা থেকে মস্তিষ্কে স্থিত সর্বোচ্চ চক্রের উপরে নিয়ে যেতে হয়। ভারতীয় যোগশাস্ত্র অনুসারে মূলাধার চক্রতে কণ্ডলিনী শক্তি বিদ্যমান থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই শক্তি সুপ্ত বা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। একজন যোগী কুণ্ডলিনী শক্তির সাধনায় তাকে জাগ্রত করে সুষুম্না নাড়ির মাধ্যম করে উপরের দিকে তোলেন। তিনি

এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে ধ্যানযোগে ধীরে ধীরে উপরে স্থিত চক্রগুলোতে প্রবেশ করাতে করাতে সহস্রার পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে যান। সেখানে কুণ্ডলিনী পৌঁছবার পর সাধকেরা পূর্ণ সমাধির অবস্থায় পৌঁছে যান। শরীর ও মনের ওপর তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে যায়। সেই সঙ্গে তিনি আত্মদর্শন লাভ করে পরমাত্মার অনুভব করতে শুরু করেন। এই অবস্থা দিব্য এবং উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তরের।

মনে করা হয়, রেইকির মূল সাধনা ভারত থেকেই কোনও এক সময় জাপানে গিয়েছিল। তাই স্বভাবতই রেইকিতেও শরীরস্থিত চক্রগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। হাজার হাজার বছর আগে আমাদের দেশের যোগীপুরুষরা আমাদের শরীরের যে সমস্ত জায়গায় অন্তঃস্রাবী চক্রগুলির উপস্থিতি সম্পর্কে বলেছিলেন, আজকের শরীরতন্ত্রের বিজ্ঞানীরা ঠিক সেখানেই এই এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ড বা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির অবস্থান বলে মেনে নিয়েছেন। এই অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলিই আমাদের রক্তের মধ্যে বিভিন্ন হরমোনের মিশ্রন ঘটায়।

রেইকি শাস্ত্রে চক্র হল আমাদের সূক্ষ্ম শরীরে স্থিত শক্তি কেন্দ্র বা এনার্জি সেন্টার। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেমন নিজস্ব কাজ আছে তেমনি এই চক্রগুলিরও নিজস্ব কাজ আছে। মণিপুর চক্র থেকে নীচের দিকে চক্র শারীরিক প্রয়োজনীয়তা ও ভাবনার সঙ্গে যুক্ত থাকে। উপরের চক্র মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনা ও কাজকর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই চক্রগুলোর শক্তিপ্রবাহ ও ভারসাম্যের ওপর শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থান নির্ভর করে। চক্রগুলোর ভারসাম্য নষ্ট হলে তার প্রভাব সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি বা এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ডগুলির ওপর এবং অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি থেকে নির্গত হওয়া হর্মোনের প্রভাব মানুষের শরীরের রক্ত ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে।

রেইকি ঃ এক নজরে

যে কোনও বয়সের স্ত্রী-পুরুষ রেইকি শিখতে পারেন। এর সঙ্গে প্রথাগত শিক্ষার কোনও সম্পর্ক নেই। অশিক্ষিত মানুষও অনায়াসে রেইকি শিখতে পারেন। রেইকি শেখার জন্য শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তিরই প্রয়োজন হয়। মনে রাখতে হবে যে, রেইকি একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি, কোনওভাবেই তা কোনও ওষুধের বিকল্প নয়। বরং বলা হয়, যে সমস্ত রোগী ওষুধ খাচ্ছেন, তাঁরা এর পাশাপাশি রেইকি পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে আরও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। কোনও রকম জ্বালাযন্ত্রণা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়া সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য রেইকির জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে। যেহেতু মানুষের দেহ-মন-আত্মা নিয়েই রেইকি কাজ তাই এতে কারও কোনও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।

যিনি রেইকি শক্তি বা তরঙ্গ প্রদান করতে পারেন তাঁকে বলা হয় রেইকি চ্যানেল। ফার্স্ট ডিগ্রি রেইকির ক্ষেত্রে দু'দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে রেইকি প্রশিক্ষক চারটি কোর্স করান। একে বলে শক্তিপাত বা অ্যাটিউনমেন্ট। কোনও শিক্ষার্থীকে শক্তিপাত করে রেকি চ্যানেল তৈরি করে দেওয়ার পর সেই শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছানুসারে রেইকি শক্তি নিজেকে বা অন্য কাউকে প্রদান করতে পারেন। ডক্টর উসুইয়ের মতে 'রে' হল ব্রহ্মাণ্ডীয় বা ঐশী শক্তি আর 'কি' হল জীবনী শক্তি। রেইকি শিক্ষার্থীরা দাবি করেন, রেইকি হল একটি সুসংহত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন রেইকি চ্যানেল জগতের যে কোনও জায়গায় থাকা যে কোনও মানুষের ওপর রেইকি প্রয়োগ করা সম্ভব। যদি বিশেষ স্তরে সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক আবেশ বিসর্জিত করা যায় তাহলে তা আলোর থেকেও দ্রুতগতিতে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। সে কারণে দূরে থাকা রোগাক্রান্ত মানুষকেও রেইকি শক্তি দিয়ে হিলিং করা সম্ভব। এ কারণেই ডক্টর উসুই রেইকি শক্তিকে স্বয়ংচেতন, স্বনির্দেশিত, স্ববিবেকী বলেছেন। তাই রেইকি মানে শুধুই স্পর্শ চিকিৎসা নয়। এর কাজ আরও ব্যাপক।

রেইকি শিক্ষার্থীরা বলেন, কুষ্ঠ, কিডনি স্টোন, মধুমেহ, হাড়ের সমস্যা, বাত, হাঁপানি, বধিরতা, সায়টিকা, গলার রোগ, থাইরয়েড, মেদ বৃদ্ধি, টিবি, অ্যালার্জি, সাইনাস, মাইগ্রেন, আগুনে পোড়া, আলসারের মতো রোগের ক্ষেত্রে রেইকি ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যায়। প্রথাগত চিকিৎসার সঙ্গে রেইকি চিকিৎসার কোনও বিরোধ নেই। স্বতন্ত্রভাবে রেইকি একজন মানুষকে সুস্থ করে তুলতে সক্ষম। আবার যে মানুষটি ওষুধ খাচ্ছেন তিনি তার পাশাপাশি রেইকি অনুশীলনও করতে পারেন, তাতে তিনি আরও দ্রুত সুস্থ হবেন। রেইকি শক্তির কখনও ঘাটতি হয় না। এতে নিজের ইচ্ছাশক্তি ও দুটো হাতের করতল ছাড়া অন্য কিছুরই প্রয়োজন হয় না।

তবে বলা হয়, রেইকির সীমাবদ্ধতা আছে। শরীরে জন্মগতভাবে কোনও অঙ্গ যদি না থাকে তাকে আর নতুন করে তৈরি করা সম্ভব হয় না। ভাঙা হাড়ে শল্য চিকিৎসা করে ভুলভাবে জোড়া লাগালেও রেইকি দিয়ে তা ঠিক করা যায় না। সারা বিশ্বজুড়ে রেইকি নিয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হয়েছে। চলছে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা। ফলে আজ যা রেইকি চিকিৎসার আওতার বাইরে রয়েছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে আগামী দিনে তা যে রেইকি শক্তির প্রয়োগ সারানো যাবে না এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

ঋণ — রেইকি চিকিৎসা — ডা. এম গুপ্ত, ইয়োর রেকি ট্রিটমেন্ট — ব্রন ওয়েন অ্যান্ড ফ্রান্স স্টিন, নিও রেইকি — ভিট সানকল্লো।

ভিতরের পাতার ছবি ঃ শায়েরি রায়

mriganka0208@gmail.com